তথ্য অধিকার নিশ্চিত করে সুশাসন

মোঃ খালিদ হাসান

তথ্য অধিকার হচ্ছে নাগরিকের এমন একটি মৌলিক অধিকার, যার মাধ্যমে তারা রাষ্ট্রীয় সংস্থা ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে নির্দিষ্ট তথ্য জানতে পারে। এটি শুধু তথ্য জানার বিষয় নয়, বরং স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও জনগণের ক্ষমতায়নের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। এই অধিকার কার্যকর থাকলে নাগরিকরা রাষ্ট্রের কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত থাকতে পারে এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও সেবা প্রাপ্তিতে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারে। গণতান্ত্রিক শাসনে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে তথ্য অধিকার একটি অপরিহার্য উপাদান।

বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯(১) অনুচ্ছেদে বাক-স্বাধীনতা এবং তথ্য জানার অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এই ধারা অনুযায়ী, প্রতিটি নাগরিকের বাক-স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থাকবে, যার অর্থ হচ্ছে – নাগরিকরা মত প্রকাশের পাশাপাশি তথ্য জানার অধিকারও ভোগ করবে। তথ্য জানার অধিকার না থাকলে বাক-স্বাধীনতাও পূর্ণতা পায় না, কারণ তথ্যহীন মতামত দুর্বল এবং বিভ্রান্তিকর হতে পারে।

এই সাংবিধানিক স্বীকৃতির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে সরকার ২০০৯ সালে 'তথ্য অধিকার আইন' প্রণয়ন করে। এই আইনের আওতায় সরকার, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত এবং সরকারি অর্থে পরিচালিত কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে নাগরিকরা নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় তথ্য চাইতে পারেন। আইনটি তথ্য চাওয়ার সময়সীমা, প্রক্রিয়া, তথ্য না পেলে আপিলের সুযোগ এবং তথ্য কমিশনের ভূমিকা সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করেছে। এর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণ এবং প্রশাসনের জবাবদিহি আরও সুসংহত হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো প্রশাসনিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা করা। যখন একজন নাগরিক সরকারি কোনো প্রকল্প, বাজেট বরাদ্দ, নীতিনির্ধারণ বা সেবা সংক্রান্ত তথ্য জানতে পারেন, তখন সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও কর্মকর্তারা বাধ্য হন যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনে। তথ্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা থাকলে স্বাভাবিকভাবেই অনিয়ম, গাফিলতি বা দায়িত্বহীনতার সুযোগ কমে আসে। এভাবে তথ্য অধিকার আইন রাষ্ট্রের কাজে জনগণের নজরদারির সুযোগ তৈরি করে দেয়, যা একটি গণতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তি। তথ্য গোপন রাখা হলে দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি হয়। তথ্য অধিকার আইন এই গোপনীয়তার দেয়াল ভেঙে দেয়ার একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। প্রকল্প ব্যয়ের হিসেব, ক্রয়বিক্রয় চুক্তি, তহবিলের বরাদ্দ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয় এবং কোনো অনিয়ম সহজেই চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। দুর্নীতিবাজরা জানেন, তাদের কার্যক্রম প্রকাশ্যে এলে আইনগত জবাবদিহির মুখে পড়তে হবে, ফলে তারা অবৈধ কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকে। এইভাবে তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর প্রয়োগ দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের অংশগ্রহণ ছাড়া সুশাসন নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। তথ্য অধিকার আইন নাগরিকদেরকে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হবার বাস্তব সুযোগ এনে দেয়। মানুষ যখন জানতে পারে কোথায় কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে, কাদের জন্য কী বরাদ্দ হচ্ছে, তখন তারা সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে মতামত দিতে পারে, পরামর্শ দিতে পারে কিংবা প্রয়োজনে প্রতিবাদ জানাতে পারে। এর ফলে সরকার, জনপ্রতিনিধি ও আমলারা নাগরিক স্বার্থকে গুরুত্ব দিতে বাধ্য হন। এই আইন গণতন্ত্রকে কেবল রক্ষাই করে না, বরং তাকে জীবন্ত ও সক্রিয় রাখে। 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' অনুযায়ী গঠিত তথ্য কমিশন একটি স্বাধীন ও স্বশাসিত সংস্থা, যার প্রধান হচ্ছেন একজন প্রধান তথ্য কমিশনার এবং তাঁর সঙ্গে থাকেন দুইজন তথ্য কমিশনার, যাদের একজন নারী হন। রাষ্ট্রপতির নিয়োগপ্রাপ্ত এই কমিশনের মূল দায়িত্ব হলো তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন তদারকি ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে নজরদারি করা। কমিশনের ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে অভিযোগ গ্রহণ, তদন্ত পরিচালনা, দোষী ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান (যেমন: অর্থদণ্ড), এবং তথ্য না দেওয়া সংস্থাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান।

তথ্য অধিকার কার্যকর করতে শুধু আইন থাকলেই হয় না; প্রয়োজন সাধারণ মানুষের সচেতনতা। এই উপলব্ধি থেকে তথ্য কমিশন নিয়মিতভাবে সেমিনার, কর্মশালা, প্রশিক্ষণ ও প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। স্কুল, কলেজ, সরকারি কর্মকর্তা, সাংবাদিক ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে তথ্য অধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করাই এর লক্ষ্য। এছাড়াও কমিশন বিভিন্ন মাধ্যমে (যেমন: টেলিভিশন, রেডিও, পত্রিকা এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম) তথ্য প্রচার করে, যাতে জনগণ জানে তারা কী ধরনের তথ্য চাইতে পারে এবং কীভাবে তা পেতে পারে।

তথ্য চাওয়ার পর নির্ধারিত সময়ে তথ্য না পেলে বা অসন্তোষজনক উত্তর পেলে নাগরিকরা তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। কমিশন ওই অভিযোগ খতিয়ে দেখে প্রয়োজন হলে তদন্ত পরিচালনা করে এবং তথ্য প্রদানকারী সংস্থা বা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়। প্রয়োজনে কমিশন শুনানি করে, প্রমাণ গ্রহণ করে এবং আইন অনুযায়ী দোষীদের জরিমানা বা শাস্তি প্রদান করতে পারে। এই প্রক্রিয়া নিশ্চিত করে যে, তথ্য না দেওয়া কিংবা তথ্য গোপনের প্রবণতা কমে এবং আইন কার্যকর থাকে।

তথ্য অধিকার আইন সাধারণ নাগরিককে তথ্য জানতে এবং সেই তথ্যের ভিত্তিতে দাবি জানাতে সক্ষম করে, যা সরাসরি নাগরিক ক্ষমতায়নের সঙ্গে জড়িত। একজন কৃষক, শ্রমিক কিংবা শিক্ষার্থী যদি জানেন, সরকারি প্রকল্পে কী বরাদ্দ আছে বা তাদের জন্য কী সুবিধা রয়েছে, তাহলে তারা সেই সেবা পাওয়ার দাবিতে সচেতন হতে পারেন। এভাবে তথ্য জানার অধিকার মানুষকে কেবল তথ্যপ্রাপ্ত নয়, বরং দাবি আদায়ের সক্ষম নাগরিকে পরিণত করে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠী — যেমন নারী, দরিদ্র, প্রতিবন্ধী বা জাতিগত সংখ্যালঘুদের পক্ষে সচরাচর সেবা পাওয়াই কঠিন হয়। তথ্য অধিকার আইন তাদের জন্য সুরক্ষার একটি পথ তৈরি করে। তারা জানতে পারে, তাদের জন্য কী সরকারি সহায়তা, ভাতা বা উন্নয়ন কর্মসূচি চালু আছে। তথ্য হাতে থাকলে তারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে পারে এবং নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। এইভাবে তথ্য অধিকার সামাজিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করে।

স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, বিদ্যুৎ, পানি বা সামাজিক নিরাপত্তা খাতে সেবার মান উন্নয়নে তথ্য অধিকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সেবাগ্রহীতারা যদি জানেন কীভাবে সেবা পাওয়ার কথা, কত খরচ হওয়ার কথা, বা দায়িত্বে কারা রয়েছেন — তাহলে তারা অনিয়ম বা হয়রানির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারেন। ফলে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোও দায়িত্বশীলভাবে কাজ করতে বাধ্য হয়। এভাবে তথ্য জানার অধিকার সেবাপ্রদান প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ ও নাগরিকবান্ধব করে তোলে।

তথ্য অধিকার আইন অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক শক্তি। সাংবাদিকরা কোনো ঘটনা, প্রকল্প বা কর্মকাণ্ডের পেছনের তথ্য জানতে চাইলে এই আইনের মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। আগের মতো অনুমাননির্ভর বা ফাঁস হওয়া তথ্যে রিপোর্ট তৈরির পরিবর্তে এখন আইনি পন্থায় তথ্য নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন তৈরি করা সম্ভব। এতে গণমাধ্যমের নির্ভরযোগ্যতা যেমন বাড়ে, তেমনি সত্য প্রকাশের সুযোগও প্রসারিত হয়। সাংবাদিকরা যখন সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের আর্থিক প্রতিবেদন, প্রকল্প পরিকল্পনা, দরপত্র বা কর্মপরিকল্পনার তথ্য হাতে পান, তখন তারা সেগুলো বিশ্লেষণ করে সত্যনিষ্ঠ প্রতিবেদন তৈরি করতে পারেন। এতে করে জনসাধারণ শুধু খবরই পায় না, বরং সেই খবরের পেছনের বাস্তবতা বুঝতে পারে। তথ্যের এই স্বচ্ছ প্রবাহ সাংবাদিকতাকে আরও দায়িত্বশীল, প্রমাণনির্ভর এবং ফলপ্রসূ করে তোলে, যা গণতান্ত্রিক সমাজের জন্য অত্যন্ত জরুরি। সাংবাদিকরা যখন তথ্য অধিকার আইনের সুবিধা নিয়ে প্রশাসনের ত্রুটি, দুর্নীতি কিংবা অব্যবস্থাপনা জনসমক্ষে আনেন, তখন সরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিরা আরও দায়িত্বশীল হতে বাধ্য হন। তথ্য প্রকাশের সম্ভাবনা থাকলে স্বাভাবিকভাবেই কর্মকর্তারা সচেতন থাকেন এবং তাদের কাজের জবাবদিহি নিশ্চিত হয়। এভাবে গণমাধ্যমের সক্রিয়তা ও তথ্য অধিকার আইন মিলিয়ে দেশে জবাবদিহির একটি গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠে, যা সুশাসনের জন্য অপরিহার্য।

তথ্য অধিকার আইন যতোটা গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক ততোটাই জরুরি রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও ব্যক্তি গোপনীয়তা রক্ষা। গণতান্ত্রিক সমাজে তথ্যের অবাধ প্রবাহ প্রয়োজন হলেও কিছু তথ্য এমনও থাকে যা প্রকাশ পেলে জাতীয় নিরাপত্তা বা ব্যক্তিগত নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়তে পারে। তাই তথ্য অধিকার প্রয়োগে রাষ্ট্রকে একটি সূক্ষ্ম ভারসাম্য রক্ষা করতে হয়—যাতে জনগণ তাদের প্রাসঙ্গিক অধিকার পায়, কিন্তু গোপনীয় বা স্পর্শকাতর তথ্য অপব্যবহারের শিকার না হয়। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ধারা ৭-এ বলা হয়েছে, কিছু তথ্য জনস্বার্থে গোপন রাখা যেতে পারে। যেমন—প্রতিরক্ষা ও সামরিক বিষয়ক কৌশলগত তথ্য, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সংক্রান্ত গোপন কূটনৈতিক বার্তা, ব্যক্তিগত চিকিৎসা নথি, তদন্তাধীন মামলার আলামত বা কৌশলগত তথ্য, এবং সরকারি সংস্থার নিরীক্ষাধীন নথিপত্র। এসব তথ্য প্রকাশ পেলে তা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে পারে, বিচারপ্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে, কিংবা ব্যক্তির ব্যক্তিগত অধিকার লঙ্ঘন করতে পারে।

বর্তমানে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে সব সরকারি অফিসের নিজস্ব ওয়েবসাইট রয়েছে। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে প্রতিটি দপ্তর নাগরিকসেবা, বাজেট, প্রকল্প, কর্মকর্তা-কর্মচারীর তথ্য, সেবার সময়সীমা ও খরচসহ যাবতীয় তথ্য ওয়েবসাইটে নিয়মিত আপডেট করা হয়ে থাকে। এতে একদিকে তথ্য পাওয়ার জন্য আবেদন করার প্রয়োজন অনেকাংশে কমে যায়, অন্যদিকে জনগণ স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বিভিন্ন সেবা ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত হতে পারে।

তথ্য অধিকার আইন কেবল তখনই কার্যকর হবে, যখন সাধারণ মানুষ নিজের অধিকার সম্পর্কে জানবে। তাই গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত তথ্য অধিকার বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা দরকার—যেমন: প্রচারণা, কর্মশালা, গণমাধ্যমে প্রচার, ও স্থানীয় পর্যায়ে ক্যাম্প। পাশাপাশি, স্কুল ও কলেজ পর্যায় থেকেই শিক্ষার্থীদের তথ্য অধিকার বিষয়ে ধারণা দেওয়া উচিত। পাঠ্যক্রমে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অধিক সচেতন, দায়িত্বশীল ও অধিকার সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে।

#

লেখকঃ সহকারী তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর

পিআইডি ফিচার